ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- III, January, 2025, Page No. 866-872
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.511

লোকজীবনে 'বিড়াল'

ড. সর্বজিৎ দাস, *সহকারী অধ্যাপক, নিলামবাজার কলেজ, শ্রীভূমি, আসাম, ভারত*

Received: 05.01.2024; Accepted: 20.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

A Variety of ritals and beliefs are interwined with Flok-lfe. These emerge for various reson and are followed by people as a matter of tradition. Similarly, numerous rituals and beliefs have grown up around the "CAT". Moreover, references to 'CATS' are extensive in both oral and written literature. The present article will attempt to discuss this subject in detail.

Keywords: Cat, Rituals, Beliefs, Oral and Written literature, Flok rhymes, Flok-story

'লোকজীবন' শব্দটি 'লোক' ও 'জীবন' শব্দ-দ্বয়ের যুগ্মফল। 'লোক' মানে- একই ভূখণ্ডে বসবাসরত ও সংহত জনগোষ্ঠী, যাদের সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক পরিচয়ে পারস্পরিক সাদৃশ্য বর্তমান। 'লোক' সম্পর্কে ডক্টর মযহারুল ইসলাম বলেন-

> "ফোকলোর এক একটি মানবগোষ্ঠীর সৃষ্টি, যারা একই ভৌগোলিক পরিবেশে বাস করে, যাদের জীবন ব্যবস্থা, ভাষা, জীবিকা ও ঐতিহ্যের অবলম্বন একই সূত্রে গ্রথিত। ফোকলোর সাধারণ মানুষের সৃষ্টি, অশিক্ষিত মানুষ মুখে মুখে এগুলোর সৃষ্টি করে—তা যেমন দলগতভাবে সমবেত প্রয়াসে, তেমনি ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তিগত প্রয়াসেও সৃজিত হয়- মুখে মুখেই তা প্রচারিত ও হস্তান্তরিত হয়-পূর্বপুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষে, এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতিতে-এক দেশ বা মহাদেশ থেকে অন্য দেশ বা মহাদেশ।" [ইসলাম:২০১২:০৫]।

এই 'লোক'-দের জীবনকে 'লোকজীবন' বলা যায়। তাদের সংস্কৃতি-'লোকসংস্কৃতি' তাদের সাহিত্য-'লোকসাহিত্য' বলে আখ্যায়িত।

লোকজীবনের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে নানারকম সংস্কার-বিশ্বাস-আচার। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন এসবের পেছনে রয়েছে সাধারণ মানুষের জটিল মনস্তত্ব। কোনও কিছুর অন্তরালে থাকা যৌক্তিক কার্যকরণ অনুসন্ধান না-করে, সেই ঘটনাকে আনুগত্যবশত স্বীকার করার মানসিকতা থেকে সংস্কার-বিশ্বাস-আচার ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব বলে কেউ কেউ মনে করেন। আবার কারো মতে ওগুলোর নেপথ্যে ক্রিয়াশীল রয়েছে আদিম জাদু-বিশ্বাস-

> "স্মরণাতীত কাল থেকে পুরুষানুক্রমে অলৌকিক-অতিলৌকিক সম্পর্কে একটা অযোচনীয় ভয়-বিস্ময়-ভক্তি ইত্যাদি মিশ্রিতভাব মানুষের মানসিক উত্তরাধিকার হিশেবে সঞ্চিত হয়ে আছে। কখনও ধর্মপ্রীতি, কখনও জাদুবিশ্বাস. কোনও সময়ে লোকসংস্কার, কখনও আবার আচার (রিচুয়্যাল) রূপে সেটাই আত্মপ্রকাশ করে। মূল বোধটা জাদুতে নিহিত প্রত্যয়কে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে; আর তারই পরিশীলিত অভিব্যক্তি ধর্মবিশ্বাসে এবং অপরিশীলিত আত্মপ্রকাশ ঘটেছে সংস্কারের মধ্যে। এই দুয়ের ব্যবহারিক প্রয়োগ সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় সৃষ্টি হয়েছে লোকাচারের। অবশ্যই সেটা আর্থ-সামাজিক স্বার্থের কারণেই যে, একথাটুকু বুঝতে হবে।" [সেনগুপ্ত :২০১০:১০৮]।

অর্থাৎ প্রবাহমাণ জাদুবিশ্বাসের ফলে সংস্কার-বিশ্বাস-আচার ইত্যাদি প্রচলিত থাকে। আমাদের আলোচ্য লোকজীবনে বিড়ালের উপস্থিতির কার্যকরণ উক্ত জাদুবিশ্বাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলা যায়। বিড়ালকে নিয়ে নানারকম সংস্কার-বিস্বাস লোকজীবনে, এমনকি নাগরিকজীবনেও ক্রিয়াশীল রয়েছে। অন্ধবিশ্বাস-কুসংস্কার ইত্যাদি অভিযোগ তুলে লোক-মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া দুষ্কর। বরং প্রথাসিদ্ধ মানসিকতার গহবরে প্রবেশ করলে লোকজীবনে বিড়ালের প্রাসঙ্গিকতার জট খুলবে।

'বিড়াল' বা 'বেড়াল' শব্দটি এসেছে 'বিড়' শব্দ থেকে, যার অর্থ- 'আক্রোশ' বা 'বিষ্ঠা'। আক্রোশে বা রেগে গেলেই বিড়াল আঁচড়ায়। বিষ্ঠা যখন ত্যাগ করে তার আগে বিড়াল মাটি আঁচড়ায়; আবার মলত্যাগের পর আঁচড়ানো মাটি দিয়ে তা ঢেকে রাখে।

'মানুষ ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ জীব'— এই শংসাবাক্যটি মানুষ নিজেই নিজের সমর্থনে রচনা করেছে, মানবেতর কোনও প্রাণী দ্বারা তা প্রদত্ত নয়। কাজেই অন্যান্য প্রাণীকে নিয়ে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করতে সে স্বাধীন এবং এইগুলো দিয়ে বিভিন্ন কার্য সম্পন্ন করতে সক্ষম। পশু যখন আয়ের উৎস হল, মানুষ তখন সেগুলো গৃহে পালন করলো; শ্রমের সহায়ক হল— যত্ন নিল; ভয় পেলো— শ্রদ্ধা জানালো; প্রেম জাগলো— পুষতে থাকলো; ক্ষতি করলো— মেরে দিল; খিদে পেলো— কেটেকুটে সাবাড় করলো...। এভাবে মানুষের রোজনামচায় পশু-পাখি ব্যাপক উপস্থিতি লাভ করল। কালক্রমে কিছু কিছু পশু প্রাত্যহিকতার নানা অনুষঙ্গে জড়িত হল। এদের নিয়ে গড়ে উঠলো বিবিধ আচার-সংস্কার-বিশ্বাস ইত্যাদি। পাশাপাশি মানুষের মননঋদ্ধ মানসিকতার সংকেত হিসেবে কিছু কিছু পশুনামের ব্যবহারও প্রাসঙ্গিক হল। লোককথার একটি বিশেষ শ্রেণি 'পশুকথা', পশুকে উপজীব্য করে সৃষ্টি হল। কাজেই পশুকে বাদ দিয়ে মানুষের 'শ্রেষ্ঠজীব' তকমার অহংকার কার্যত বৃথা। মানুষের নানা পরিসরে পশুকুল সংযুক্ত, নানাভাবে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিবিধভাবে এর একটি উদাহরণ— বিড়াল।

বিড়াল ষষ্ঠীদেবীর বাহক। দেবীর সঙ্গে সেটিও সমাদৃত। কাজেই সৌভাগ্যের সংকেত সে বহন করে। এই বিড়াল আবার অশুভের ইঙ্গিতবাহী হয়, যখন যাত্রাকালে সে রাস্তা কাটে।

এভাবে বিড়াল বিভিন্ন অশুভ লক্ষণের ইশারা দেয়। যেমন— (ক) যাত্রাকালে বিড়ালের কান্না শোনা অশুভ ইঙ্গিত। (খ) রাত্রিকালে বিড়ালের কান্না শোনা ব্যাধির লক্ষণ। (গ) বিড়ালের হাসি ঝগড়া-ক্ষতি-বাধাবিপত্তির সূচক (ঘ) সঙ্গমরত বিড়ালকে দেখলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়।

বিড়ালকে নিয়ে নানা সংস্কারে বিদেশেও প্রচলিত রয়েছে। বৃষ্টি কামনা করে বাতাবিয়ায় (Batavia) ছোটছোট ছেলেমেয়েরা সঙ্গীতসহ শোভাযাত্রা করে কোনও জলাশয়ে একটি বিড়ালকে চুবায় এবং কিছুক্ষণ পর তা ছেড়ে দেয়। একই কামনায় বিড়ালকে স্নান করানো হয় জাভায়। সুমাত্রা অঞ্চলে কোথাও কোথাও

মহিলারা নিজেদের মধ্যে জলকেলি করে একটি কালো বিড়ালকে সাঁতার কাটায় বৃষ্টি আনয়নের জন্য। রয়েছে বিশ্বাসও। ইতালিতে কোনও রোগীর বিছানায় কালো বিড়াল শুলে মৃত্যু আসন্ন। স্কটিশরা বিশ্বাস করে সে, কালো বিড়াল ঘরে ঢুকলে সমৃদ্ধি হয়।

বিড়ালকে কেন্দ্র করে রয়েছে সংস্কার-বিশ্বাসও। যেমন— (ক) মিশরে হুলো বিড়াল সূর্যের প্রতীক, মেনি বেড়াল চন্দ্রের। সেখানে বিড়ালের হাঁচি সৌভাগ্যের প্রতীক। তবে তিনের অধিক হাঁচলে শৈত্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হবে বলে তাদের বিশ্বাস। (খ) ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে বিড়াল গমনরত মানুষের রাস্তা কাটলে অশুভ। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে সাদা বা কালো কুকুর একই কাজ করলে অশুভ নাশ হয়। (গ) উইনস্টন চার্চিল মনে করতেন, চলন্ত কালোবিড়ালকে স্পর্শ করলে সুখ-সৌভাগ্য লব্ধ হয়। (ঘ) এদেশে বিড়াল পা-চাটলে, তা মাথায় তুললে বা মাটিতে মুখ ঘষলে বাড়িতে অতিথির আগমন হয়। (ঙ) বিড়ালের মতো তামাটে রঙের চোখ-থাকা মহিলা ঝগড়াটে ও সন্দেহবাতিক হয়। (চ) বিড়ালকে ঝাঁটা দিয়ে কোনও মহিলা প্রহার করলে, তার সন্তানের আয়ুক্ষয় হয়। (ছ) বিভিন্ন দেশে কালো বিড়াল মঙ্গলের প্রতীক। এমনকি কালো বিড়াল রাস্তা অতিক্রম করলে যাত্রীর শুভাগম হয়। (জ) পৌষমাসে বাড়ি থেকে বিড়াল তাড়ালে ধনক্ষয় হয়। (ঝ) বিড়াল নিধন করলে সেটির সময়-ওজনের লবণ দিয়ে মাটিতে পুঁততে হয়।

আসামের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিড়াল নিয়ে বিস্তর মানামানি রয়েছে। নষ্টে সম্প্রদায়: যাত্রাকালে বিড়ালের কান্না শোনা অমঙ্গলসূচক। সিংফৌ: পোষ্য বিড়াল বাড়ি ত্যাগ করলে গৃহস্থের অমঙ্গল। নেপালি: বিড়ালের 'মেও মেও' চেঁচামেচি ঝগড়াও মৃত্যুর সংকেতবাহী। মিসিং: কালো বিড়াল ঘরে থাকলে ভূতপ্রেত প্রবেশ করে। মরাণ: গৃহে বিড়াল থাকলে ও বংশবৃদ্ধি করলে গৃহস্থের মঙ্গল। রাভা: জলপানরত বিড়ালকে দেখলে গৃহে অতিথির আগমন ঘটে। তিওয়া: বিড়াল হত্যা করলে সোনার বিড়াল দান করতে হয়। চা-জনগোষ্ঠী: ঘরের চৌকাঠে বিড়ালের আঁচড় অশুভবাহী।

লোকজীবনের বিভিন্ন অনুষঙ্গে কিংবা লোকসাহিত্যেই 'বিড়াল'-এর উপস্থিতি কেবল নয়, লিখিত সাহিত্যেও বিড়াল-প্রসঙ্গ বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থে নামের কবিতা রয়েছে— "সারাদিন একটা বেড়ালের সঙ্গে ঘুরে ফিরে কেবলই আমার দেখা হয়।" সৈয়দ মুজতবা আলি লিখেছেন 'মার্জার নিধন কাব্য' (পঞ্চতন্ত্র, পৃ-৫৬)। "খানা আইল সেই/ বিবির পেয়ারা/ বিড়াল আসিল সাথে/ সেই না করিল/ মরমিয়া 'ম্যাও'/ থাবা না তুল্যা হাতে।" সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যামণি' কবিতায় বেড়ালের উল্লেখ পাই — "সময়ের গলায় এখনও আড় হয়ে আছে ঘড়ির কাঁটা/ ও বেড়াল, তোমার পায়ে পড়ি/ খুলে দাও না।" "সুখের অত্যন্ত কাছে বসে আছে অসুখী বিড়াল"— [বিড়াল, 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো?'] লিখেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সুকুমার রায়ের 'হযবরল' গ্রন্থে রয়েছে— "আমি বললাম, 'কী মুশকিল! ছিল রুমাল, হয়ে গেল বিড়াল।" ঠাকুরমার ঝুলিতে পাই 'পিকুর বিড়াল'। 'প্রফেসর শঙ্কু'তে সত্যজিৎ রায় বিড়ালের নাম রেখেছেন 'নিউটন'। শিশু সাহিত্যিক নারায়ণ দেবনাথ লিখেছেন — 'বাহাদুর বেড়াল সমগ্র'। 'বেড়াল ঠাকুরঝি' নামের গল্পগ্রন্থ রয়েছে বিভূতিভূষণ গুপ্তের। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ঝুনু মাসির বেড়াল', শহীদুল জহিরের 'ইঁদুর বিলাই খেলা', নবনীতা দেবসেনের 'মঁসিয়ে ভুলোর হলি-ডে', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'কালো বেড়াল, সাদা বেড়াল', হিমাদ্রি কিশোর দাশগুপ্তের 'সাদা বিড়াল' প্রভৃতিতে বিড়াল এসেছে নানাভাবে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিড়াল' প্রবন্ধের কথা সর্বজনবিদিত। আসামের অসমিয়া সাহিত্যেও বিড়াল-প্রসঙ্গ দুর্লভ নয়। ভারতী চাংকাকতি বরুয়া লিখেছেন 'মেকুরি' নামের প্রবন্ধ। বিড়ালকে অসমিয়া ভাষায় মেকুরি বলা হয়। ড. নির্মলপ্রভা বরদলৈর ছড়াতে পাই— "মেকুরি আহ আহ/ মিউ মিউ মিউ/ গাখীর আছে, মাছ আছে / আরু আছে ঘিউ।" লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া লিখেছেন 'মেকুরির জিয়েকর সাধু' গল্প। বিড়ালকে নিয়ে গল্প লিখেছেন

মাখন ভূঞা তাঁর 'জোনবাইর দেশর সাধু' গ্রন্থে। প্রবীণা শইকিয়ার 'অবিনাশী স্বপ্ন' গল্পে একটি কালো বিড়ালের প্রসঙ্গ রয়েছে। অসমিয়া শিশুসাহিত্যিক রত্নেশ্বর বরা রচনা করেছেন 'নিগনি আরু মেকুরি' নামের সাধুকথা। লেখার শিরোনামে না-থাকলেও বাংলা সাহিত্যের গল্প-প্রবন্ধ-কবিতায় 'বেড়াল' রয়েছে বিস্তর পরিসর নিয়ে। যেমন— উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'মস্তাপ আলীর সরকার', পরশুরামের 'ষষ্ঠীর কৃপা', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুষু-ভুলোর বনবাস', শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'পেয়ারার মুন্সী', বুদ্ধদেব বসুর 'মন্টু আর মোনি', হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'মার্জার কাহিনী', শিবরাম চক্রবর্তীর 'অল্প আয়োডিন ঘটিত', বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'দিদিমনির বেড়াল', সুনির্মল বসুর 'সর্বনাশী বাঘের মাসি', বাণী রায়ের 'সবুজ বেড়াল', মহাশ্বেতা দেবীর 'বেড়ালদের দেশে যাওয়া', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ঝুনুমাসির বেড়াল', সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'বড়মামার বেড়াল ধরা' ইত্যাদি আরও অনেক রচনায় বিড়াল-এর প্রসঙ্গ রয়েছে। বোঝাই যায় লোকজীবন হোক নাগরিক জীবন— বিড়ালের উপস্থিতি রয়েছে ব্যাপক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বন্যপ্রাণী কল্যাণ আন্তর্জাতিক পুঁজি (International Fund For Animal Welfare) ২০০২ সাল থেকে ৮ আগস্ট দিনটি 'বিড়াল দিবস' হিসাবে পালন করে আসছে।

লিখিত সাহিত্যে বিড়ালের প্রসঙ্গ যেমন পাওয়া যায়, মৌখিক সাহিত্যেও এর ব্যতিক্রম নেই। লোকজীবনের অন্তরঙ্গ অনুষঙ্গ লোককথা; আর লোককথার একটি শাখা ব্রতকথা, সেখানে বিড়ালের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য— বিড়াল হচ্ছে দেবী ষষ্ঠীর বাহন। ষষ্ঠী যেমন প্রজননের সাংকেতিক দেবী, বিড়ালও তাই। স্বামী নির্মলানন্দর 'দেবদেবী ও তাদের বাহন রহস্য' গ্রন্থে বিড়াল প্রজনন-শক্তির প্রতীক বলে উল্লিখিত। সেজন্য ষষ্ঠীর ব্রতকথায় বিড়ালের কথা পাওয়া যায়। ব্রতকথাটির সারাংশ হল— এক বাড়ির দুই বউ-এর ছোট বউ প্রতিদিন মাছ চুরি করে খেতো এবং দোষ দিতো বিড়ালের ওপর। বিড়ালের এতে মনোবেদনা হত। দেবী এই বেদনার কথা জানলে ছোট বউকে শাস্তি স্বরূপ তার সাতটি ছেলেকে নিধন করেন। পুত্রশোকে ছোট বউ বনবাসী হয় এবং প্রচণ্ড দুঃখকষ্টে তার দিন কাটতে থাকে। একদিন দেবী ষষ্ঠী ছদ্মবেশ ধারণ করে ওই ছোট বউয়ের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে যাবতীয় বৃত্তান্ত শুনে, তাকে ষষ্ঠীব্রত এবং বিড়ালকে আদরযত্ন করার নিদান দেন। ছোট বউ কথামতো সবকিছু করতে থাকে। ফলস্বরূপ তার হারানো সমস্তকিছু ফিরে পায় এবং আনন্দ-উল্লাসে দিন অতিবাহিত হতে শুরু করে। এভাবে ষষ্ঠীব্রত দিকে দিকে প্রচলিত হতে থাকে।

আসামের অসমিয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'সাথার ব্রত' বা 'সাথা বরত' নামে একটি লোকপার্বণ প্রচলিত আছে। সাত দিনের সাতটি লোকাচার নিয়ে পালন করা 'সাথা ব্রত'-এর তৃতীয় দিনের ব্রতকথায় 'সাতে মেকুরি' অর্থাৎ সাতো নামের একটি বিড়ালের কথা রয়েছে। কথাটির মূলকেন্দ্রে রয়েছে সদ্গুণসম্পন্ন একটি বিড়াল। একজন রমণী যদি সদ্গুণসম্পন্না না-হন, পঞ্চমাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিশীলা হতে না-পারেন, তাহলে তিনি পবিত্র রমণী হয়ে উঠতে পারবেন না। এই হল ব্রতকথাটির মূলকথা।

লোকজীবনের অন্তর্গত লোকসাহিত্যের একটি শাখা ছড়া, ছড়াতেও বিড়ালের কথা পাওয়া যায় বিভিন্ন ভূমিকায়। যেমন—

০১। মাছ ছাড়ে না দিঘি পুকুর
হাঁ ছাড়ে না, বিড়াল কুকুর।
(খেলার ছড়া)।

০২। মাছ মরেছে বিড়াল কান্দে, শান্ত করলে বকে
ব্যাঙের শোকে পাতার পানি, দেখি সাপের চোখে।

০৩। খুকু যাবে শ্বশুর বাড়ি
সঙ্গে যাবে কে?
বাড়িতে আছে হুলো বেড়াল
কোমর বেঁধেছে।
০৪। রামণি বাবুর পরনে ট্যানা
বে' করেছে বিড়াল ছানা
একটি ধানে দুইটি তুষ
আয়রে মেনি পুস পুস।
০৫। থাকরে বিড়াল মাছের আশে
মাছ পাবি তুই আঘন মাসে
কুকুর না যায় গয়া কাশী
বিলাইয়ের নাই মাসি পিসি।
০৬। আয় আয় মেনি পুসি
দুধ খাবি আয়।
মাছ মেখে ভাত দেবো
জলদি গাঙ্গে নেয়ে আয়।
[সংগ্রহঃ প্রবাহঃ জুন ২০২৩]

বাংলা প্রবাদে বিড়ালের প্রসঙ্গ অপ্রতুল নয়। নিচে কিছু পরিবেশিত হল—

১. ছাগলের কান নাড়া, গরুর কাশ
বিড়ালের হাঁচি, করে সর্বনাশ।
২. নি-কামানে নাপিত, বিড়াল ধরেও কামায়
(অকর্মণ্যের কর্ম দর্শানো)
৩. নিম লংকা দিয়ে ভাত খাই
বিড়ালকে কাঁচকলা দেখাই।
(ভয়ের জন্য কর্মে বিরত থেকে মেকি সাহস প্রদর্শন)
৪. বড়বাড়ির বিড়ালটাও বড়লোক
(পরিবেশ পরিস্থিতির পরিণাম)
৫. বাঘের মাসি বিড়াল, আসবে বলে ফেরার।
(কথার দাম যার নেই)
৬. বুদ্ধিমান বিড়ালের ইঁদুর দেখলেই দৌড়
(যার কর্ম শুধু স্বার্থ উদ্ধারে)
৭. বিড়াল যখন দুধ খায় বুজিয়ে দুই চোখ
(আরাম আয়েসের প্রতিচ্ছবি)
৮. বিড়ালের খসখসানি নরম মাটির ওপর
(দুর্বলের ওপর সকলের চাপ-চাপানি।)
৯. বিড়ালের পায়ে পড়লে কি গলার কাঁটা উলে (নামিয়া যায়)

(যথাস্থানে / যথাযথ ব্যবস্থা না নিয়ে অযথা বাগাড়ম্বর করলে কি সমস্যার সমাধান হয়?)
১০. বিড়ালের পিঠে হাত বুলালে লেজ মেটা হয়।
(ফুসলিয়ে, মন গলিয়ে কার্যোদ্ধার করা)
১১. বিড়ালের ভরসা শিকের ঘোল।
(পরের ওপর প্রত্যাশী / নির্ভরশীল হওয়া)
১২. বিড়ালের মতো ধাঁচা, বাঘের মতো লোক।
(সাহসী / সুঠাম ব্যক্তি)
১৩. বিড়ালের মারণ প্রথম রাতেই
(শুরুতেই শায়েস্তা করা)
১৪. বিড়ালের রাগ খাবার ওপর
(কাজের মাধ্যমে পরিচয় প্রদান)
১৫. শিকারি বিড়াল, গোঁফে চেনা যায়।
(কর্মদক্ষের পরিচয় তার অবয়বে)
১৬. শিকের মাছ বিড়ালের হারাম
(না পাওয়ার বেদনা আত্ম-সান্ত্বনা দিয়ে ঢাকা)
১৭. সস্তা মাছ বিড়ালে কাঁটা বাছে।
(মূল্যহীনের কদরহীনতা)
১৮. স্ত্রী বিড়ালেরও গোঁফ আছে।
(কাজেকর্মে সতর্ক থাকা)।
১৯. ইঁদুর জানে না বিড়াল কানা
(অক্ষমকে চিনতে না পারা)
২০. মাছের শোকে বিড়াল কাঁদে।
(কপট শোক প্রকাশ)
২১. মাছ মরেছে বিড়াল কাঁদে
শান্ত করলে বকে।
(কপটের লোক দেখানো কাজকর্ম)
২২. সেকরা বাড়ির বিড়াল ঠুকঠুকানিতে ভয় পায় না।
(যে যা প্রতিনিয়ত দেখে, তাতে সে ভয় পায় না)
২৩. বাসর রাতেই বিড়াল মারতে হয়
(শায়েস্তা করতে হলে শুরুতেই করতে হয়)
২৪. ইঁদুর বলে বিড়াল মাসি
আমি তোরে ভালোবাসি।
(আত্মরক্ষা নিমিত্ত আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টা)
২৫. একে বিড়াল কালো
তায় গাঙ সাঁতরে এলো।
(দুর্বলের কঠিনকর্ম সম্পাদনে আশ্চর্যান্বিত হওয়া)

২৬. উচিত মাতে মাই বেজার
গরম ভাতে বিলাই বেজার।
(কারও দোষ ধরিয়ে দিলে, সে ব্যক্তির প্রকাশিত ক্রোধ)
২৭. কাঠের বিড়ালই হোক, ইঁদুর ধরলে হল।
(রূপগুণের দরকার কী! প্রয়োজন মিটলেই যথেষ্ট)
২৮. কায়েতের ঘরের বিড়ালটাও দুই অক্ষর জানে।
(পরিবেশ প্রভাবের ফল)
২৯. টিপরা (ঝিমিয়ে থাকা) মেকুর সর খাইবার আন্ধি (ওস্তাদ)
(চেহারায় ভোলাভালা হলেও ভেতরে শয়তান।)
৩০. শুটকির (শুকনো মাছ) নায়ে বিলাই চকিদার।
(ভক্ষকের কাছে রক্ষকের দায়িত্ব)
৩১. উস্কো মাটিতে বিড়াল হাগে।
(অধিক নম্রতায় বিপদ হানে)
৩২. হুলার (হুলো বিড়াল) গোসা মচা আউচরানি (আঁচড় দেওয়া)
(কাজকর্মের সীমাবদ্ধতা)

বাংলা বাগধারায় বিড়াল প্রসঙ্গ রয়েছে। যেমন : (ক) থলির বিড়াল বেরিয়ে পড়া (গোপন প্রকাশিত হওয়া)। (খ) বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া (যা পাওয়ার কথা নয়, তা লাভ করা)। (গ) বিড়ালের ঝগড়া (অহেতুক চেঁচামেচি)। (ঘ) বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা (কার্যোদ্ধারের জন্য ঝুঁকি নেওয়া)। (ঙ) বিড়াল কত শিকারি (দক্ষতার মাপ নেওয়া)। (চ) ভিজে বিড়াল (বাইরে শান্ত, ভেতরে ধূর্ত)। (ছ) বিড়ালের দুধ প্রহরা (রক্ষকই ভক্ষক)। (জ) ষষ্ঠীর বিড়াল (পরিপুষ্ট)।(ঝ) যজ্ঞের বিড়াল (ছদ্মবেশী)। (ঞ) বক-বিড়ালে ব্রহ্মচর্চা (মিথ্যাচারীর সম্ভাব দর্শানো)। (ট) বিড়াল তপস্বী (ভণ্ড)। (ঠ) বিড়ালের মার আড়াই পা (ক্ষণস্থায়ী রাগ/অভিমান) ইত্যাদি।
পরিশেষে, মানুষের আচার-বিশ্বাস-সংস্কার-সাহিত্য ইত্যাদিতে 'বিড়াল' প্রসঙ্গ অপাঙক্তেয় নয়, দেখা গেল। মানুষের এই পরিসরে বিড়াল কিভাবে অনুপ্রবিষ্ট হল, তা আলোচনার দাবি রাখে, তবে তা স্বতন্ত্র। কার্যত, মানবেতর বিভিন্ন প্রাণীর সঙ্গে মানুষের নিকট-দূর সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেগুলোর ব্যবহারিক প্রয়োজনে। বিবর্তনের মাধ্যমে। সেইসূত্রে বিড়ালও মানুষের বিভিন্ন অনুষঙ্গে জড়িত হয়ে গিয়েছে। উপযুক্ত তথ্যের মাধ্যমে তা অনুধাবন করা যায়।

তথ্যসূত্র:

১. ইসলাম, মযহারুল। ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন। অবসর, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৩৫।
২. সেনগুপ্ত, পল্লব। লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ। পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১০৮।

সহায়কগ্রন্থ:

১. চক্রবর্তী, বরুণকুমার। লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার। কলকাতা, ২০০৩ ইং।
২. কোঁওর, জ্যোতিপ্রসাদ (সম্পাদিত)। জনগোষ্ঠীয় লোকবিশ্বাস। গুয়াহাটি, ২০১৮ ইং।